অগ্রন্থিত শহীদ কাদরী

অগ্রন্থিত শহীদ কাদরী

সম্পাদক
সজল আহমেদ

অগ্রন্থিত শহীদ কাদরী
সম্পাদক : সজল আহমেদ

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২০

প্রকাশক
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম বেইজমেন্ট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
নীরা কাদরী

প্রচ্ছদ
সব্যসাচী হাজরা

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য: ১৭৫ টাকা

Agronthito Shahid Kadri edited by Sajal Ahmed Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market Kantabon Dhaka 1205 First Edition: August 2020
Cell: +88-01717217335 Phone: 02-9668736
Price: 175 Taka RS: 175 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-94933-3-4

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

ভাইয়া (শাহেদ কাদরী) এবং ভাবী (রেবেকা কাদরী)
যাদের আশীর্বাদের ছায়ায় শহীদ-এর পথচলা

দুটি কথা : প্রসঙ্গ, অগ্রন্থিত শহীদ কাদরী

শহীদ কাদরী এ কালের একজন অগ্রণী চিন্তক। বিনা তর্কেই এটা মেনে নেয়া যায়। চিন্তার প্রকাশ ঘটে ভাষাকে আশ্রয় করে। তাঁর রচনায় ভাবনা চিন্তা প্রকাশ করেন ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে। উভয় ভাষাতেই তাঁর সমান দখল। যদিও তার কবি পরিচিতি পাঠকদের মনে এক বিরাট আসন দখল করে আছে, তবুও তাঁর প্রবন্ধ কেন জানি মনে হলো পাঠকদের হাতে পৌঁছনো দরকার। বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো গ্রন্থবদ্ধ করা হয়েছে এই বইটিতে। এই লেখাগুলো প্রায় সবই বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে ছড়ানো ছিটানো ছিল।

শহীদ কাদরীর রচনাদির প্রাসঙ্গিকতা সব সময়ই বর্তমান, কারণ তাঁর ভাবনা চিন্তার ভিত্তিতে আছে আবেগহীন মৌল বিচার। তাঁর রচনাদির সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় না থাকাটা সেই হেতুই এক বড় ক্ষতি বলে আমি মনে করি। এমন একটি অনুভবই আমাকে 'অগ্রন্থিত শহীদ কাদরী'র কাজে এগিয়ে আসতে উৎসাহ দিয়েছে।

এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করার কালে প্রফেসর মাসুদুজ্জামান অক্লান্ত সাহায্য করেছেন। তাকে আমার ধন্যবাদ জানাই। সম্পাদক ও প্রকাশক সজল আহমেদ-এর প্রতি রইল আমার অশেষ ভালোবাসা ও শুভকামনা, যার উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছাড়া এই বইয়ের প্রকাশ সম্ভব হতো না।

নীরা কাদরী
২৪ আগস্ট ২০২০

সূচিপত্র

ধ্বনি প্রতিধ্বনি (১৪ মে ১৯৭৮) ১১
ধ্বনি প্রতিধ্বনি (২৮ মে ১৯৭৮) ১৬
ধ্বনি প্রতিধ্বনি (১১ জুন ১৯৭৮) ২২
ধ্বনি প্রতিধ্বনি (২৫ জুন ১৯৭৮) ২৬
ধ্বনি প্রতিধ্বনি (৯ জুলাই ১৯৭৮) ২৯
ধ্বনি প্রতিধ্বনি ৩২
পরাবাস্তব ভূ-খণ্ডের কবি পাবলো নেরুদা ৩৬
বুদ্ধদেব বসু ৩৯
শামসুর রাহমান : শিল্পে শহীদ ৪২
মানবিক ঋতুর কবি : ইয়ান্নিস রিৎসস ৪৪
Two Poems ৪৯
Yannis Ritsos, the poet of the human century ৫১
Buddhadev Bose (1908-1974) ৬০
Will drug rescue literature? ৬৪
A note on post-war British poetry ৬৭
Death of poet ৭১

ধ্বনি প্রতিধ্বনি (১৪ মে ১৯৭৮)

আমাদের দেশীয় সামাজিক কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তিত না হলে এখানে সমাজতত্ত্বের ওপরে পড়াশোনার কোনো সার্থকতা থাকবে না।

স্বাধীনতার পরে তরুণ সমাজের উচ্ছৃঙ্খল এবং হতাশাগ্রস্থ হওয়ার পেছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থাই ছিল মূলত দায়ী। ইকবালের ধারণা, তরুণরা সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বদলে দেখতে পেল তাদের বাঁচার পথ ক্রমশঃ রুদ্ধ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে আসছে। যার জন্যে তারা পড়াশোনায় উৎসাহ হারিয়ে ফেলে, তাছাড়া এই সময় মূল্যবোধেরও দ্রুত অবনতি ঘটে। ইকবাল বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আরবান স্টাডিজের একজন গবেষণা সহকারি। ভবিষ্যতে তার শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে নেওয়ার ইচ্ছে রয়েছে। তার মতে, চিন্তা-ভাবনার বিকাশের জন্য এই পেশাই সবচেয়ে উপযোগী। আন্তর্জাতিক পত্রপত্রিকা ছাড়াও বিশেষ করে সমাজতত্ত্বের ওপরে প্রকাশিত জার্নাল নিয়মিত পড়েন। নিজেও লেখেন, নিজের লেখা ছাপা হলে খুব আনন্দ হয়। প্রিয় লেখকদের মধ্যে বাংলায়, সমরেশ বসু ইংরেজিতে, বার্ট্রান্ড রাসেল।

আবাহনী এবং আজাদ বয়েস ক্লাবের যে কোনো খেলা উৎসাহ নিয়ে দেখেন। প্লেয়ারদের মধ্যে ফুটবলে সালাহউদ্দিন, নান্নু ক্রিকেটে, ইউসুফ বাবু'র খেলা তার ভালো লাগে।

বিশ্বের উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ফুটবলের কিংবদন্তী পেলে, উগান্ডার প্রেসিডেন্ট ইদি আমিনের সঙ্গে ইকবাল ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করবেন যদি কখনো সুযোগ পান।

সম্প্রতি একটি অত্যন্ত মূল্যবান বই হঠাৎ বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরির কল্যাণে এক নিঃশ্বাসে পড়ে উঠতে পেরেছি। এবং আমার মনের ওপর বইটির অভিঘাত এখনও অনুভব করছি। তিরিশ পেরুনোর পর সচারচর কোনো কিছুই আর খাওয়া-নাওয়া ভুলে যতিহীনভাবে একটানা পড়ে ওঠা প্রায় কারু পক্ষেই সম্ভব নয়। অথচ অধ্যাপক রুডলফ বিনিয়ান-এর 'হিটলার আমং দ্য জার্মানস' আমার একটি আস্ত রোববার গ্রাস করে ফেলেছে। সত্যি হিটলারের ভূত এখনও শ্যাওড়াতলায় ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে। এই একজন ভদ্রলোক যাঁকে নিয়ে গবেষণার অন্ত নেই। কেউ কেউ এমনও মন্তব্য করেছেন যে একমাত্র যীশুখৃষ্ট ছাড়া এ্যাতো বই আর

কারো ওপর লেখা হয়নি। কারণও রয়েছে যথেষ্ট। রেনেসাঁর উত্তরাধিকারী আধুনিক ইউরোপের জরায়ুতে যত বিচিত্র ধরনের বীজের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, তার কোনোটার মধ্যেই আপাতঃ দৃষ্টিতে হিটলার উপ্ত ছিল বলে মনে হয় না। অর্থাৎ ইতিহাসবেত্তারা তা মনে করেন না। যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঐতিহাসিক-অর্থনৈতিক কারণগুলোর সঙ্গে আমরা সবাই মোটামুটি পরিচিত, এবং তথাকথিত মিত্রশক্তিই শেষ অবধি জার্মানিকে হত্যাযজ্ঞে টেনে এনেছিল বলেই আমরা জানি, তবুও এডলফ হিটলার নামক একজন মানুষ তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যে শোণিতলিপ্সা প্রদর্শন করে গেছেন মানবেতিহাসে তার সত্যি কোনো তুলনা নেই। চেঙ্গিস অথবা সিজার, তৈমুর কিংবা বোনাপার্ট অর্থাৎ জগৎ এই লেখার মুহূর্ত পর্যন্ত যত প্রখ্যাত ডাকাত-খুনিদের সন্ধান রাখে, সব্বাই মোটামুটি হিটলারের কাছে ছেলে-মানুষ। সিজার ও নেপোলিয়ান সম্বন্ধে অনায়াসে বলা যায় যে ইতিহাসের অমোঘ ও রহস্যময় হাত যেমন তাঁদের তৈরি করে নিয়েছিল, তাঁরাও তেমনি পাল্টা ইতিহাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার চিহ্ন রেখে গেছেন। তাঁদের পদচ্ছাপ ইউরোপের সর্বত্র পাওয়া যায়। ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু নির্মাণও এনেছিলেন তাঁরা। ইউরোপের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন ব্যবস্থা, এমনকি আইন শাস্ত্রের বিভিন্ন সূত্রের মধ্যে তাঁরা আজও টিকে আছেন এবং পরোক্ষ আজও নানাভাবে সাম্প্রতিক মানুষের বাঁচার পদ্ধতি, ভাবনার রীতি, অনুভবের ভঙ্গী বেশ খানিকটা রাঙিয়ে দিচ্ছেন। অর্থাৎ ওঁদের গল্প একেবারে ফুরিয়ে যায়নি। অথচ হিটলারের নটে গাছটি মুড়িয়েছে চিরকালের জন্য। এখন রয়ে গেছে শুধু তাঁর স্মৃতি তাঁর অকল্পনীয়, উপমারহিত, ভয়াবহ অপরাধগুলোর স্মৃতি।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, হিটলারের নটে গাছটা কি সত্যি আমূল উপড়ে গেছে? আমাদের এই স্বভাবতই দুঃখীগ্রহে দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার, চতুর্থবার হিটলারের অন্ধকার উত্থান কি সম্ভব নয়। হিরোশিমা উত্তর বিকলাঙ্গ বিশ্বে প্রশ্নটির প্রাসঙ্গিকতা সহজে ক্ষয় পাবে বলে মনে হয় না। কেননা যেভাবেই হোক আমাদের জানতেই হবে কোন কোন উপাদানে একজন হিটলার সম্ভব হতে পারেন? প্রাণধারণের পরিবেশে মানবিকতার ঠিক কতটুকু অভাব ঘটলে, শিক্ষা ব্যবস্থায় কতখানি ত্রুটি থাকলে, নৈতিক মূল্যবোধগুলো কতটা দূষিত হলে ইতিহাসের উদ্ধত, রাগী সিস্ন আবারও এমন এক ক্ষমতাসম্পন্ন পুরুষকে উপহার দিতে পারে যাঁকে চোখের পানিতে ভেসে আরো একবার আমরা হিটলারের সহোদর হিসেবে সনাক্ত করতে বাধ্য হবো!

সিজার অথবা নেপোলিয়ানের বাল্যদশায় সবগুলো পূর্বাভাষই ছিল। এঁদের সহোদরদের আমরা অঙ্কুরেই চিনে নিতে পারব। ব্যারী গোল্ডওয়াটারকে চিনতে কষ্ট হয়নি আমাদের। আমেরিকার জনসাধারণের কল্যাণে ইতিহাসের 'ট্র্যাশফ্যান' তাঁকে লুফে নিয়েছে। কিন্তু হিটলারের শৈশব ছিল অত্যন্ত শাদা-মাটা, মেধা ছিল

মাঝারি। তাঁর মৃত্যুর তিরিশ বছর পার হয়ে গেছে। আজ এটা সুস্পষ্ট যে, রাসায়নিক প্রক্রিয়া হিটলারের মধ্যে কাজ করেছে, তা সিজার অথবা নেপোলিয়ান থেকে স্বতন্ত্র গুণগতভাবে ভিন্ন। ঠিক এই কারণেই তাঁর ব্যক্তিত্বের কুয়াশাময় উৎস এখনও ইতিহাসবেত্তাদের জন্য অনুসন্ধেয়। কিন্তু ইতিহাস গবেষণার সাধারণ, প্রথানুগ পদ্ধতি তাঁকে বুঝতে পারেনি। তাঁর যে একটি মনস্তাত্ত্বিক ডিমোশন রয়ে গেছে সে সম্বন্ধে সবাই একমত। এমন কি ডঃ এ্যালেন বুলক-এর মতো ইতিহাসবিদও এ কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছেন যে অন্য কোনো বিজ্ঞানের দ্বারস্থ না হলে হিটলারের ব্যাপারে আমরা প্রাথমিক তিমিরেই থেকে যাব। তাই রুডলফ বিনিয়ন-এর মতো মনো-বিশ্লেষকের পক্ষে হিটলারের ব্যাপারে আগ্রহী হওয়াটা বেশ স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে আমার। তিনি 'হিটলার আমং দ্য জার্মানস' বইটিতে কাজ করেছেন সাইকো-হিস্ট্রির মতো একটি অর্বাচীন এবং অনির্ভরযোগ্য শাখায়। বিজ্ঞান হিসেবে স্বয়ং মনস্তত্ত্ব এখনও হামাগুড়ি দিচ্ছে। তার নাবালকদশা ঘুঁচেছে বলে এখনও জানিনি। আর মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাস বা সাইকোহিস্ট্রির যাত্রা সবে শুরু। রূপকথার সঙ্গে এই বস্তুটির তফাৎ এক চুলেরও কিছু কম। আর আমি মানসিকভাবে আমার শৈশব (আমার বন্ধুরাও এ ব্যাপারে একমত) এখনও দৌড়-বীরের মতো এক লাফে পেরিয়ে যেতে পারিনি বলেই হিটলারের মানসজীবনের উন্মোচনমূলক নাটকীয় বিশ্লেষণ পড়ে খামোখা একটি আস্ত রোববার খরচ করে ফেলেছি। এমনিতেই আজকাল কবি-মহলে (কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছেন) বই-পড়ার রেওয়াজ একেবারেই উঠে গেছে (অবশ্য লুকিয়ে অনেকেই পড়েন, তবে প্রকাশ্যে এখনও স্বীকার করেন না। আর করলেও 'দেশ' 'অমৃত' শক্তি, সুনীল অলোকরঞ্জনের মধ্যেই সীমিত রাখেন। কারণ এ সবের সরাসরি অনুপ্রবেশ এবং অনুকরণ এমন সঙ্গীতের মতো এঁদের লেখায় নাম উঁচিয়ে থাকে যে অস্বীকার করার প্রায় জো থাকে না)। পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে ধান ভানতে শিবের গীত এড়াতে পারলাম না। নিজে কচিৎ কবিতা লিখি বলে হিটলার প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক কাব্যধারা ঠিকই টেনে এনেছি। একেই বলে ঢেঁকির স্বর্গে গিয়ে ধান ভানা। তা এবার মূল প্রসঙ্গে ফেরা যাক।

অধ্যাপক বিনিয়ন-এর বইয়ের ব্যাক-জ্যাকেটে দেখলাম বিশুদ্ধ ইতিহাস চর্চায় বিশ্বাসী স্বয়ং এ্যালেন বুলক (হিটলারের বিষয়ে এর অগাধ পাণ্ডিত্য পাশ্চাত্যে তর্কাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত) বইটি প'ড়ে বিশেষভাবে উপকৃত বোধ করেছেন। কিন্তু সাইকোহিস্ট্রির ওপর তাঁর আস্থা আছে কিনা সে সম্বন্ধে তিনি একেবারেই নিশ্চুপ। তবে তাঁর কল্যাণে আমরা জানতে পারলাম যে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে হিটলারের ব্যক্তিগত জীবনে এবং জার্মান জাতির সমষ্টিগত জীবনে প্রচণ্ড এবং অসহনীয় মানসিক আঘাত প্রাপ্তির (ট্রম্যাটিক) অভিজ্ঞতা সঞ্চিত ছিল। ব্যক্তি ব্যষ্টির মধ্যে এবং ব্যষ্টি ব্যক্তির মধ্যে পরস্পরের অবিকল প্রতিচ্ছায় সনাক্ত করেছিল প্রায়

আর্শির মতো স্বচ্ছতায়। হিটলার এবং জার্মান জাতি যেন দুঃখী সহদোর, একই সুরে-বাঁধা, সমব্যথী যমজ।

হিটলারের এই ট্রমার (মানসিক আঘাতের) উৎস হচ্ছে দুটো প্রায় সংলগ্ন ঘটনা। ১৯১৮ সালে গ্যাসজনিত বিষক্রিয়ায় হিটলারের প্রায় মরণাপন্ন দশা এবং অল্প কিছুক্ষণ পরে এক ইহুদী ডাক্তারের চিকিৎসাধীন হিটলারের মাতৃদেবীর ক্যান্সার রোগে বেদনাদায়ক মৃত্যুবরণ। জার্মান জাতির বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতাটিও একই বছরে, একই সমান্তরালে অর্জিত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধে সার্বিক—এবং সম্পূর্ণরূপে অপ্রত্যাশিত এবং সহ্যের অতীত—পরাজয় ও তার গ্লানি। কিন্তু এই দু'টি স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতার উৎসের চেয়ে ঢের বেশি তাৎপর্যময় হচ্ছে অভিজ্ঞতার প্রকৃতি। মনস্তাত্ত্বিকের ভাষা ব্যবহার ক'রে বিলিয়ন বলেছেন যে ঐ জাতীয় ট্রমা (মানসিক আঘাত) যেমন ব্যক্তিকে, তেমনি একটি জাতিকে বারবার স্মৃতিচারণে ক্ষমাহীনভাবে প্ররোচিত করে। স্মৃতির মধ্যে বারবার ঘটনা তার সমস্ত অনুপুঙ্খসহ অভিনীত হ'তে থাকে এবং এক অসহ্য দম-বন্ধ-করা, প্রবল চাপ তৈরি করে আক্রান্ত ব্যক্তি কিংবা জাতির মধ্যে। এর থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় হচ্ছে নতুন নতুন পরিস্থিতির ভেতর প্রাক্তন অভিজ্ঞতার পুনর্সৃজন। এ জাতীয় মুক্তির প্রয়োজনীয়তা অবশ্যম্ভাবী, অনিবার্য এবং অনড়। পরিবেশের মধ্যে ঐ অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটানোর পথে যে অন্তরায়ই থাকুক না কেন, তাকে অপসারণ করা হবেই। বরং প্রমাণিত হয়েছে যে পরিবেশ যতই বিঘ্নসংকুল হবে, আক্রান্ত ব্যক্তি বা জাতির জীবনে অতীত অভিজ্ঞতাটির নবনির্মাণের তাড়না ততই প্রচণ্ড ও ভয়াবহ হয়ে উঠবে। তার যাবতীয় নৈতিক মূল্যবোধ ধ্বসে গিয়ে অন্তর্স্বভাব এই মৌল তাগিদের অনুকূলে চলে যাবে। সর্বপ্রকার বিবেকী দ্বিধা উবে যাবে বাষ্পের মতোই। সুতরাং কেউ যদি যথেষ্ট 'ট্রম্যাটাইজড' হয়, তাহলে তার পক্ষে কোটি কোটি নিরপরাধ, নিঃসহায় মানুষকে সংহার করা ছেলেখেলা বৈ অন্য কিছু নয়। আর ঠিক এই অর্থেই হিটলার এবং জার্মান জাতির 'ট্রম্যাটিক' (মানসিক অভিজ্ঞতার) অভিজ্ঞতা ঘটে। এবং ঐ একই কারণে হিটলার এবং জার্মান জাতি একাত্ম হতে পেরেছিল। কান্ট, হেগেল, গ্যয়েটে, সিলার, মোৎসার্ট, বেটোফেন প্রমুখ স্বজাতিদের ওপর এডলফ হিটলারের মতো একজন মাঝারি মেধার কুশ্রীদর্শন উচ্চকণ্ঠ ব্যক্তি মাঝারি মেধার কুশ্রীদর্শন উচ্চকণ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে সম্মোহনতূল্য প্রভাব বিস্তার করা কিভাবে সম্ভব হয়েছিল? আমাদের সাধারণ বুদ্ধি—এমনকি পণ্ডিতদের—তার জবাব জানে না। অথচ জবাবটা জানা অত্যন্ত জরুরি! অধ্যাপক বিনিয়ন-এর মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আপাতদৃষ্টিতে গ্রহণের অযোগ্য মনে হয় না। কিন্তু এ ব্যাখ্যা বিজ্ঞানসম্মত অর্থাৎ পরীক্ষিত সত্য নয়। এই বিশ্লেষণ রীতিই পরীক্ষার পরপারে। মূলতঃ অনুমান নির্ভর, এবং খানিকটা কল্পনাপ্রসূত বটে। তবু হিটলারের যে কোনো জীবনী পড়লে কার্য এবং কারণের মধ্যে বিদ্যমান বিজ্ঞান ব্যবধান সম্পর্কে সচেতন না হয়ে উপায় থাকে না, তা

খানিকটা পূরণ করে এ জাতীয় মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। ইতিহাসের অন্যান্য হত্যাপ্রবণ নেতৃবৃন্দের মধ্যে এই প্রক্রিয়া ও মনস্তত্ত্বকে কাজ করতে দেখা যায়, দেখা গেছে। কিন্তু হিটলার ও জর্মানির মতো অমন বিশাল, প্রচণ্ড ও ভয়ংকরভাবে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি, অমন আতঙ্কপ্রসূ ডিমেশনও তাঁরা পাননি। এ একেবারে নতুন, সদ্যোজাত, রেনেসাঁ-উত্তর, একেবারেই আধুনিক। এবং ভীষণভাবে ভয়াবহ। একবার যখন সম্ভব হয়েছে, দ্বিতীয়বারও-সম্ভব হবে। রুদ্রের এই কালো বীজ আহত মানুষ ও পরাস্ত জাতিরাই নিজেদের অজ্ঞাতসারে সত্তার প্রত্যন্তলোকে লালন করতে থাকে। মনস্তাত্ত্বিক ইতিহাসের এই সিদ্ধান্তকে খাটো ক'রে না দেখাই কল্যাণজনক। কেননা তাহলে আমরা হয়তো কিছুটা সতর্ক হবো। আজকের এই বিব্রত, এক ফোঁটা গ্রহে নতজানু, পরাস্ত মানুষ আর অপমানিত রাষ্ট্রের সংখ্যা বেড়ে চলেছে প্রতিদিন।

মনে রাখতে হবে এদের মতো অসহায় ও বিস্ফোরক এ জগতে আর কিছুই নয়।

সূত্র : সচিত্র সন্ধানী। প্রথম বর্ষ। চতুর্থ সংখ্যা। ১৪ মে ১৯৭৮

ধ্বনি প্রতিধ্বনি (২৮ মে ১৯৭৮)

আমি খুব ছেলেবেলাতেই একটি প্রচণ্ড আঘাত পাই। এবং সেই আঘাত আমাকে এমন এক মরু-আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেয় যার তিন দিগন্তেও সেদিন কোনো আশ্রয়ের আশ্বাস খুঁজে পাইনি। অনেকদিন পর্যন্ত গোপনে, একা একা, ছাদের চিলেকোঠায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে হয়েছে আমাকে।

তখন আমার রূপকথার গল্প পড়ার বয়স। কিন্তু আমি রূপকথা পড়তাম না। আমার বাবা ভুলেও 'ঠাকুর মার ঝুলি' কিংবা সুকুমার রায়-এর 'আবোর-তাবোল' ঢুকতে দেননি ঘরের ত্রিসীমায়। স্কুল ফেরা পথে এলিয়ট রোডের দোকানে সাজানো লাল, নীল, হলুদ রঙের চকচকে মলাটের যে বস্তুগুলো আমার 'রাত্রির নিদ্রা এবং দিবসের স্বপ্ন' হরণ করে নিয়েছিল তাকে বলা হয় 'কমিক'। গলায় রুমাল, মাথায় ফেল্ট-হ্যাট, পায়ে বুট, কোমরে পিস্তল-গোঁজা টম মিক্স রয় রজার্স, জিন আর্ট্রি, হপালঙ ক্যাসাডি এই সব 'কাউবয়' নায়ক ছিলেন আমার বাল্যকালের 'হিরো'। স্কুলে, রোববারে বাসার সামনের মাঠে আমরা খেলতাম কাউবয়-কাউবয় (কানামাছি নয়।)। দৈবাৎ এমন একটি পরিবারে আমার জন্ম, যেখানে ইংরিজিই ধ্যান-জ্ঞান, ইঙ্গবঙ্গ সমাজের যোগ্য সদস্য হওয়াটাই ছিল একমাত্র কাম্য। উপরন্তু একটি প্রাচীন মুসলমান বংশের উত্তরাধিকারের সূত্রে বাংলা ভাষাকে বিধর্মীয় ভাষা হিসেবে জ্ঞান করতে শেখানো হয়েছিল আমাদের। বৈষয়িক উন্নতির জন্যে ইংরেজি, এবং ধর্ম-চর্চার জন্যে আরবী-উর্দুকেই মনে করতাম যথেষ্ট। বলাবাহুল্য ওরকম মনে করানো হ'তো। কিন্তু সে ফাঁড়া আমি কাটিয়ে উঠেছি নেহাৎ বরাতের জোরে। নইলে আজ 'না ঘরের না ঘাটের' অবস্থা এড়াতে পারতাম না কিছুতেই।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। কাউবয় নায়করাই ছিলেন আমার 'হিরো'। অতএব কাঁহাতক আর হোলস্টরহীন, পিস্তলহীন অবস্থায় কাউবয়-কাউবয় খেলা চলবে। সহপাঠিরা সবাই কোমরের হোলস্টারে পিস্তল গুঁজে খেলতে আসে। আমি শুধু যাই খালি হাতে। পিস্তল একটি আমার চাই-ই। বাবাকে রোজই একবার করে একটি (অবশ্যই খেলনা) পিস্তল কিনে দেয়ার কথা বলতাম। কিন্তু আপিস থেকে ফিরতি পথে পিস্তলটি কেনার কথা তিনি যেতেন ভুলে। এভাবে দুতিন মাস কেটে গেল, পিস্তল তবু আসে না। আমারও ধৈর্য প্রায় ফুরোতে বসেছে যখন, বহুকাঙ্ক্ষিত পিস্তলটি এল।